কাজলের শেষ ইচ্ছা

মিনহাজ আহমদ

সেদিন অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ফোন কল পেলাম সজল পাল-এর কাছ থেকে। অত্যন্ত হাসি-খুশী এই সজল পালের সাথে আমার পরিচয় অনেকদিনের। তিনি একজন সৌখীন কণ্ঠ ও অঙ্কন শিল্পী, থাকেন নিউ ইয়র্কের ব্রংক্স-এ। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাত বা যোগাযোগ নেই, তাই হঠাৎ তার ফোন পেয়ে বিস্মিত হলাম। ফোন করার কারণ জানার পর আমার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। ছত্রিশ বছর আগে মারা যাওয়া ভাইয়ের অবদানের একটুকরো কাগুজে স্বীকৃতি নিতে কেউ যে এভাবে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ট্রেনে চড়ে আমার সাথে দেখা করার জন্য আসবে, প্রথমে আমি ভাবতেই পারিনি।

সজল পাল যে সূত্র ধরে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন, তা ছত্রিশ বছরের পুরনো। তবে ঘটনাটির স্মৃতি আমার কাছে অম্লান। প্রায় প্রতি ডিসেম্বরে অনেকটা রুটিনের মতোই মনে পড়ে। ভুলতে না পারা ছত্রিশ বছর আগের সেই ঘটনাটি নিয়েই আমার আজকের এই লেখা।

সদ্য বিজয় অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ তখনও বন্ধ। আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, বয়স প্রায় এগারো। যুদ্ধের ভয়াবহতায় পালিয়ে বেড়ানো পাড়া-পড়শীদের মধ্যে আমরা কয়েকটি পরিবার যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রিয় শহর মৌলবীবাজারে ফিরে এসেছি। নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পেরে আমাদের আনন্দের যেনো শেষ নেই। স্কুল তখনও খোলেনি বলে ছোটরা সকাল সন্ধ্যা সারাদিন একসাথে হই-হুল্লোর করে কাটাচ্ছি। এমন একটি দিন বিশ ডিসেম্বর, সময় সকাল এগারোটা। বাসার পাশের মাঠে বাঁশ ঝাঁড় থেকে গোড়াসমেত তুলে আনা লাঠিকে হকিস্তিক বানিয়ে টেনিস বল দিয়ে হকি খেলছিলাম। তখন হঠাৎ খুব কাছেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো চারদিক। পশ্চিম আকাশে দেখা গেলা কুণ্ডলি পাকানো একরাশ ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যে লতাপাতার মতো উড়ন্ত কিছু বস্তু। মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো খেলা। বিস্ফোরণের শব্দে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসী আর ভীতু খেলার সাথীরা দৌড়ে পালালো। আমরা অতি উৎসাহীরা ধোঁয়ার উৎসের দিকে ছুটে গেলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে চৌমোহনা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম আমাদের স্কুল মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, যেখানে রয়েছে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। নিঃশ্বাস বন্ধ করা উৎকট বারুদের গন্ধে ভারী বাতাস। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে চুন-সুড়কির গুড়ো, ইট-পাথর, স্কুলের আসবাবপত্র। স্কুলের দুটি ভবনকে সংযুক্ত করা যে বিশাল করিডোরে পাকসার জমিন গেয়ে আমরা প্রতিদিন সকালে অ্যাসেম্বলি করতাম, সে জায়গাটা পুরো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। লাল রং দেয়া টিনের চাল স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপারে ফুটবল মাঠের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে।

আমাদেরকে স্কুলের ভেতরে যেতে দেয়া হলো না। তবে বড়দের অনেকেই গেলেন স্বেচ্ছাসেবক হিশেবে উদ্ধারকাজে সহায়তা করতে। এদের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, আমাদের পাড়ার ইয়ংস্টার ক্লাবের সংগঠক সৈয়দ আবু জাফর ছিলেন। ঘটনার কেন্দ্রস্থল থেকে অলৌকিকভাবে আহত হয়ে বেঁচে যান সেনাবাহিনী থেকে কিছুদিন আগে অবসর নেয়া ব্রিগেডিয়ার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান তারই সহযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন চৌধুরী রানা। ক্যাম্প থেকে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ দূরে মুক্তিযোদ্ধা রহিম বখ্‌শ্‌ খোকার বাসা। সকালের দিকে নাস্তা সেরে ছুটি নিয়ে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করে ফিরে আসেন খোকা। মৃত্যু যেনো তার জন্য ওৎ পেতে ছিলো, এসে ধরা দিলেন

জালে। এক হস্তরেখাবিদ এসেছিলেন ক্যাম্পে কারো সাথে দেখা করতে। মৃত্যু তাকেও রেহাই দেয়নি। এক সাহসী উদ্ধারকর্মী রাস্তার পাশে পড়ে থাকা আস্ত একটা ঝলসানো পা তুলে আনলেন। এরকম কুড়িয়ে আনা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাছেই স্তুপ করে রাখা হয়েছে। উদ্ধার করা লাশগুলো রাখা হলো স্কুলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে। কারো হাত নেই, পা নেই, কারো বা মুখের দিকটা ঝলসে গেছে, চেহারা চেনাই যাচ্ছে না।

বিস্ফোরণের একজন প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের সমন্বয়কর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম চৌধুরী, যিনি নিজেও ঘটনাটিতে আহত হয়েছিলেন। পরবর্তিতে প্রকাশিত তার এক লেখা থেকে জানা যায়, সেদিন আনুমানিক বিশ-একুশজন হতভাগা মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ সম্পর্কে সালাম চৌধুরী অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও তিনি ধারণা প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধারকৃত বোমা, মাইন ইত্যাদি বিস্ফোরকদ্রব্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন না করে নাড়াচাড়া করায় কিংবা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় এই বিস্ফোরণটি ঘটে থাকতে পারে।

যদিও আমি তখন ১১ বছরের কিশোর, তবুও স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক কথা আমার আজও মনে আছে। ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে মাথার উপরে বোমারু বিমানের মুহূর্মুহূ শেল নিক্ষেপের মধ্যে ভয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণেছি। শিহরিত হয়েছি পাঁচগাঁওয়ের ব্রাশ ফায়ার করে মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশত মানুষকে হত্যা করার কাহিনী শুনে। মনু ব্রিজের ওপর যখন হানাদার পাক সেনারা স্থানীয় মুসলিম লীগের দালালদের সহায়তায় সুন্দর মিয়া এবং আরো ২জনকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রদর্শনী করে গুলি করে হত্যা করে, তখন আমি ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে। আরও দেখেছি স্থানীয় এক মুসলিম লীগ নেতাকে যুদ্ধে নিহত কয়েকজ ন ভারতীয় সৈন্যকে পাক-আর্মির ট্রাকে করে প্রদর্শন করতে। মুসলিম লীগ নেতা নিষ্প্রাণ সেই মৃতদেহে লাথি মেরে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন।

ন্যাপ করতেন আমাদের কানুদা। ২৫ মার্চ গভীর রাতে কানুদা ও অবনী সূত্রধর আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। ভোরে উঠে দেখা গেলো, আমাদের রান্না ঘরের লাগোয়া একচালা ঘরে তারা, ভয়ে কাঁপছেন। সূর্য উঠার আগেই আমাদের বাসায় চা-নাস্তা সেরে সৈয়ারপুরের পথে তারা পালিয়ে যান। অন্যরা গা ঢাকা দিতে পারলেও ধরা পড়ে গেলেন কানুদা। তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে জীপে করে সারা শহর ঘুরেছে পাক সেনারা। স্বাধীনতা যুদ্ধে মৌলবীবাজারের প্রথম শহীদ কানুদাকে সেই আমার শেষ দেখা।

স্মৃতির ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করা অনেক ঘটনার মাঝেও চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ৪দিন পর আমাদের মৌলবীবাজ ার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সংঘটিত সেই বিস্ফোরণের ঘটনাটি আজও আমার চোখে ভেসে উঠে। চোখে ভাসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত লাশ, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন স্তুপীকৃত ঝল্‌সে যাওয়া নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্কুলের খেলার মাঠে দেয়াল ঘেরা সমাধি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, মৃত্যুর পরও তাদেরকে পাশাপাশি একই জায়গায় নিজ নিজ ধর্মীয় প্রথায় সমাহিত করা হয়। প্রতিদিন কলেজে যাওয়ার পথে চোখে পড়তো দেয়ালঘেরা সমাধি।

আজ দীর্ঘদিন পরও অম্লান রয়ে গেছে সেই স্মৃতি। তাই আমরা যখন মৌলবীবাজার জেলা সমিতি ইউএসএ'র পক্ষ থেকে মৌলবীবাজার জেলার মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে সনদপত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই, তখন শ্রীমঙ্গলের মুক্তিযোদ্ধা বিরাজ কুমার সেন (তরুণদা) শহীদ কাজল পালের নামটি আমার কাছে দিয়ে বলেছিলেন, শহীদ কাজ ল পালের পরিবারের পক্ষ থেকে তার এক ভাই সনদপত্র নেবেন। ঘটনাক্রমে সেদিন কাজল পালের পক্ষ থেকে কেউ সনদপত্র নিতে আসেননি। কিন্তু পরের দিনই আমি কথিত ফোন কলটি পাই সজল পালের কাছ থেকে। শহীদ কাজল পালের আপন ছোট ভাই সজল পাল, আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বড় ভাই কাজল পাল প্রাণ বাজি রেখে দেশের জন্য লড়েছেন, দেশ স্বাধীন করেছেন, এবং শহীদ হয়েছেন। ভাইয়ের জন্য গর্বিত সজল পাল আমার কাছ থেকে তার ভাইটির উদ্দেশ্যে দেয়া সনদপত্রটি নেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। আমি ব্যস্ততার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের সময় করে উঠতে পারছিলাম না। একদিন ঠিক হলো, আমি সনদপত্রটি অফিসে নিয়ে আসবো, তিনি

আমার সাথে দেখা করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি সেদিনও সাথে নিতে ভুলে যাই। পরে ঠিক হয়, অফিস শেষে তিনি জ্যামাইকাতে আমার সাথে বাসায় যাবেন।

বাসায় বসে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয় সজল পালের সাথে। তার সংগ্রহে কাজলের একটা ছবি আছে, যত্ন করে সংরক্ষণ করেছেন। তার একটা কপি আমাকে দেবেন, বল-লেন সজল পাল। (উপরে সেই ছবিটি ছাপা হলো) তিনি আমার সাথে দীর্ঘক্ষণ তার ভাইয়ের স্মৃতি রোমন্থন করলেন। বললেন আমৃত্যু মায়ের পরিতাপের কথা। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে, যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি, কাজল গিয়েছিলেন প্রিয় মা-বাবা-ভাই-বোনদের সাথে দেখা করতে। মায়ের বুক থেকে যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়া সন্তানকে কাছে পেয়ে অভিমান বেড়ে যায় মায়ের। সেদিন কাজল মায়ের কাছে ছোট্ট শিশুর মতো মায়ের হাতে রান্না করা তার প্রিয় খাবার চিকেন বিরিয়ানি রান্না করার বায়না ধরেন। অজানা আশঙ্কাকে দূর করতে মা আচ্ছা করে বকে দিলেন সন্তানকে, যেনো সে আর যুদ্ধে না যায়। কিন্তু দেশমাতৃকার ডাকে যে ঘর ছেড়েছে, সে কী আর বাবা-মায়ের মায়ার বন্ধনে ধরা দেয়! মায়ের হাতের রান্না চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার সাধ পূরণ না করেই কাজল ফিরে যায় রণাঙ্গনে।

এরপর কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশ স্বাধীন হয়। মা খুশি, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছেলেকে আর যুদ্ধে যেতে হবে না। অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন মা, কখন ছেলে আসে। ছেলে ফিরে এলে রান্না করবেন তার প্রিয় খাবার। কিন্তু অপেক্ষার দিন একসময় ফুরোয়। বিশ ডিসেম্বর মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েমুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে সংঘটিত বিস্ফোরণ কেড়ে নেয় কাজলকে। কাজল চলে গেলো, কিন্তু মায়ের জন্য রেখে গেলো করুণ স্মৃতি। ছেলে প্রিয় মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খেতে চেয়েছিলো, কিন্তু অভিমানী মা তার সে ইচ্ছাটি পূরণ করেননি। এই আফসোসে অশ্রুপাত করতে করতে একদিন মা-ও বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে।

একাত্তরে দেশমাতৃকার জন্যে যারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন, তাদের কোন একান্ত নিজের জন্য কোন চাওয়ার ছিলোনা। বিষয়-সম্পত্তি, খেতাব, ব্যক্তিগত স্বার্থ- কোন কিছুই নয়। আজ আমরা যারা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছি, তাদের দায়িত্ব হলো সেই মুক্তিযোদ্ধারা যে জাতীয় লক্ষ্যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের দায়িত্ব হলো সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।
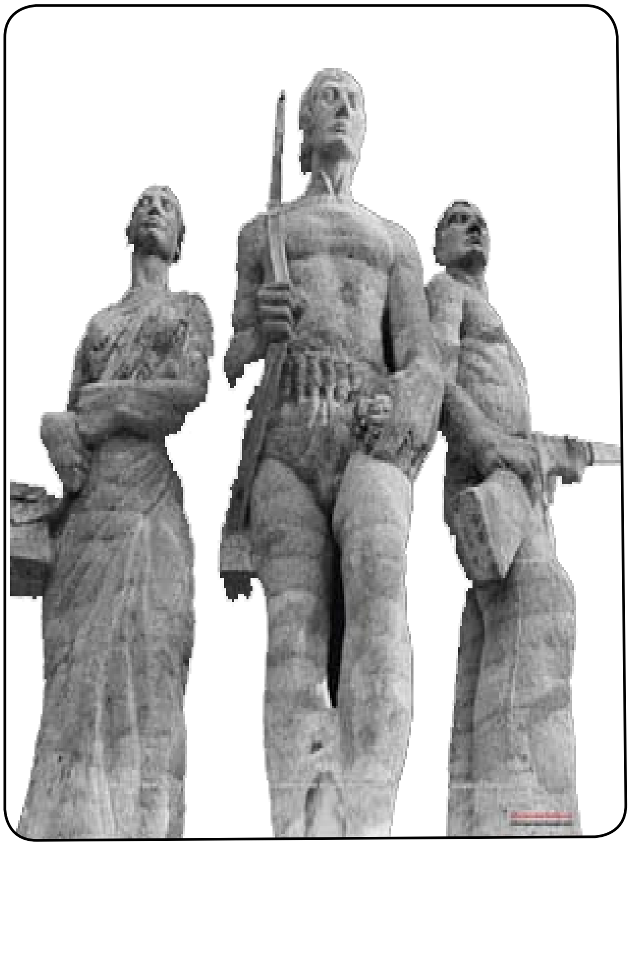
বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের দেশে একাত্তরের ঘাতক দালালরা দিনে দিনে যেভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে, তাতে আশঙ্কা হচ্ছে, একদিন তারা হয়তো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই দেশের শত্রু হিশেবে আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবে। হয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধ করার জন্যই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়ার দাবি তুলবে।